Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 442 – 451
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্রনাথকে কেন চাই

ড. পৌলোমী তালুকদার
সহ অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, খড়্গপুর কলেজ
ইমেইল : tpoulomi@gmail.com

Keyword
স্বাধীনতা, অপরতা, ক্ষমতায়ন, স্বাতন্ত্র্য, সত্তা-নির্মাণ, আত্মশক্তি।

Abstract
রবীন্দ্রনাথের কাছে অনন্বয়িতা বা অপরতার সমস্যাই হল প্রধান সমস্যা। অপরতার সমস্যার সঙ্গে জিড়িয়ে আছে আত্মশক্তির অভাব, যা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। তাঁর মতে সামাজিক শক্তির উৎস হিসাবে আত্মশক্তি সমগ্র জাতির মধ্যে জারিত হয়নি। সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিগুলি যেদিন থেকে অবুদ্ধির বা প্রজ্ঞাহীনতার দ্বারা চালিত হয়েছে সেদিন থেকেই মানুষ দাসত্বকে স্থায়ীভাবে বরণ করে নিয়েছে। একেই রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তিহীনতা বলেছেন। এই আত্মশক্তিহীনতা আর স্ব-অপরীকরণের সমস্যা দুটি একে অপরের পরিপূরক। তিনি এই সমস্যার ক্ষেত্রটিকে একটি সংশ্লেষাত্মক সমস্যার ক্ষেত্র বলে মনে করেছেন। এই মর্মে রবীন্দ্রনাথ আমাদের তাত্ত্বিক বা সত্তাতাত্ত্বিক এবং বেশ কিছু প্রায়োগিক সমাধানের পথ দেখিয়েছেন, যেগুলি আজও প্রাসঙ্গিক। আসলে রাবীন্দ্রিক চিন্তন আমাদের কাছে এমন একটা পদ্ধতি যাতে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সংশ্লেষাত্মক মিশেল রয়েছে, যা আমাদের সাম্য, স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের ধারণাকে নতুন করে নির্মাণ করতে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস। এই প্রবন্ধে সামাজিক বাস্তবতা ও তাত্ত্বিক বিশ্বাসের যুথবদ্ধতায় জীবনের যে প্র্যাক্সিসকে গঠন করতে আমরা উদ্যত হয়েছি তা পেতেই রবীন্দ্রনাথকে ফিরে দেখা।

Discussion

এক

রবীন্দ্রনাথকে কেন চাই ও চাইলে কীভাবে চাই এই দুটি প্রশ্নের প্রতি সৌরিন ভট্টাচার্য্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছিলেন। সৌরিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুসরণ করেই বলতে চাই যে- রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক কিনা সেটা বড় কথা নয়, প্রাসঙ্গিকতাটি হল তাঁকে আমরা আমাদের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারি কিনা বা তুলতে চাই কিনা সেটাই বড় কথা। এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতার ভারকেন্দ্রটি দাঁড়িয়ে আছে চাহিদা ও প্রয়োজনের উপর। 'কেন চাই' এই প্রশ্নের দুটি দিক আছে- একটি হল তার প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদার দিক, অন্য দিকটি হল আধিবিদ্যক। এই দুটি দিকের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক, আধিবিদ্যক ও সমাজবিদ্যার এক অনুস্যূত প্রতিচ্ছেদকতার (intersectionality) সম্পর্ক রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আধিবিদ্যক অবস্থানের প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে এই প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে তার যতটুকু অংশ এসে পড়বে ততটুকুই আমরা আলোচনা করব। কারণ তাঁর অধিবিদ্যক অবস্থান

এতটাই ব্যাপক যে, তার জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র অনুসন্ধান কার্যের দাবি রাখে। যাই হোক, আমাদের এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হল সামগ্রিকভাবে কেন রাবীন্দ্রিক ধারাকে গ্রহণ করা আবশ্যক তাকেই আলোচনা করা। একটি বিষয়ে আগেই বলে রাখা ভালো, রাবীন্দ্রিক চিন্তন শৈলীকে যখন আমরা কাজে লাগাতে চাইছি তখন আমরা যে সবসময় বিশ্লেষণী (analytical) পদ্ধতিতে এগোতে পারব এমনটা নয়। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু কোনো স্বীকৃত বা ঘোষিত দার্শনিক নন তাই তাঁকে আমরা 'হিউম্যানিস্টিক' পদ্ধতিতে গ্রহণ করব। যতটা সম্ভব তাঁর সামগ্রিক জীবন এবং চিন্তা ধারার মধ্যে দিয়েই তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করব প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ বা কবি রবীন্দ্রনাথ বা সাহিত্যিক কিংবা গল্পকার বলে আলাদা এখানে উচিৎ হবে না। কেন এভাবে গ্রহণ করব তার একটি বিশেষ যুক্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর সমস্ত লেখনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর বাস্তব জীবন যাপনের, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মাধ্যমে। তাছাড়া তিনি তাঁর সমকালীনতার দ্বারা আবিষ্ট ছিলেন। তাঁর পড়াশোনা, বাইরের জগতের সঙ্গে আনাগোনা, তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা, বিশ্ব রাজনীতি, সর্বোপরি ভারতীয় ঐতিহ্য ও পারিবারিকভাবে জ্ঞাত আধ্যাত্মিকতার পাঠ সবটা মিলিয়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের চিত্তরাজ্য। তিনি কোনো তত্ত্বের রচয়িতা নন। তাঁর সারা জীবনের রচনা, কাজ-কর্ম, শিল্পভাবনা, সমাজ ভাবনার মধ্যে যে একটা বিশেষ আদল রয়েছে তাকে অনুসরণ করতে হলে হিউম্যানিস্ট অ্যাপ্রচকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হবে। সামাজিক বাস্তবতা ও তাত্ত্বিক বিশ্বাসের যুথবদ্ধতায় জীবনের যে প্র্যাক্সিস গঠন করতে আমরা উদ্যত হয়েছি তাতে সেই বিশেষ আদলটিকে লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য। এবার আসি মূল প্রশ্ন-কেন চাই রবীন্দ্রনাথকে? আমাদের প্রয়োজনটা আমাদের সত্তাবোধের সঙ্গে জড়িত। আমরা যদি আমাদের ক্রমবর্ধমান ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, সেটি একটি বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস। বস্তুবিশ্ব থেকে ভাবনাবিশ্ব পর্যন্ত ব্যক্তি ক্রমাগত শুধু অন্যের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। জীবন যাপনের জন্য আমাদের স্বাধীন সত্তা প্রতিনিয়ত সংকুচিত হয়ে পড়ছে। আমরা সবাই সবসময়েই কারো না কারোর নজরদারির আওতাভুক্ত। ব্যক্তি আজ কীভাবে গঠিত হবে বা হচ্ছে সেটি আর তার হাতে নেই। ক্রমাগত ভাবনা বিশ্ব থেকে জাগতিক পরিসরে সর্বত্র মানুষ অন্যের সাধনা ও লক্ষ্য বস্তুতে পর্যবসিত হয়েছে, জীবনের নিয়ন্তা আজ কর্তার হাত থেকে 'কলের' (system) হাতে চলে গেছে। এ বিষয়ে আমরা নিজেরা এমন ভাবেই অনবগত যে এটাকে আমরা আমাদের দ্বিতীয় সত্তা বা অবশ্যম্ভাবী সত্তা বলে মেনে নিয়েছি বা কখন সবটা বুঝে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমরা প্রত্যেকেই আত্ম-বিচ্ছিন্ন আর এই আত্ম বিচ্ছিন্নতার নামই আধুনিকতা। আধুনিকতার জালে এতটাই মোহিনীশক্তি আছে যে তাকে ছিন্ন করে বেড়িয়ে আসার প্রয়াস বা তাগিদ মানুষের প্রায় নেই। কিছু পরিবর্তন বা প্রতিবাদ হয়তো হয় কিন্তু তা সর্বদা একটি ধরাবাঁধা সর্বজনীন কাঠামোর মধ্যে থেকেই হয়। ক্ষেত্র বিশেষে কাঠামোটিকে মেরামত করা হলেও তার কোনো রদবদল ঘটানো হয় না। আমূল পরিবর্তনের জন্য কাঠামোর উপাদানগত ও আকারগত সংস্কার হওয়া দরকার এমন কি বেশ কিছু প্রত্যয়েরও ধারণাগত পরিবর্তন প্রয়োজন। এই নির্মাণ ও বিনির্মাণের পরিকল্পনাতেই আমাদের ফিরে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাই বিষয়ী হিসাবে সত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যা একান্তভাবে সত্তা নির্মাণের সঙ্গে জড়িত তার বিনির্মাণ অতীব জরুরী। এই জন্যেই আমাদের বার বার করে ফিরে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে।

সত্তা নির্মাণের কথা যখন পূর্বে এসেছে তার অনুষঙ্গে যে ধারণাটি এসেছে তা হল স্বাধীনতার ধারণা। স্বাধীনতার ধারণা বিষয়ী রূপে ব্যক্তির 'হয়ে ওঠা' অর্থাৎ ব্যক্তির সত্তার নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সঙ্গে সর্বদাই জড়িত। তবে স্বাধীনতা শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন একটু ভিন্নভাবে। তিনি মনে করেন বৈচিত্র্য ও সমন্বয়ের মাধ্যমে 'সঙ্গসুধা' লাভই হল স্বাধীনতা। এই 'সঙ্গসুধা' শব্দটির অর্থ হল, যে সঙ্গ আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে, যাতে আমাদের সত্তা ঋদ্ধিমান হয়ে ওঠে সেইরূপ সহচর্যের বোধই হল স্বাধীনতা। এই অভিমত প্রথমেই আধুনিককালের সত্তা বিকাশের বিরোধবাধক। সেখানে বিচ্ছিন্নতাই হল স্বতন্ত্রতার বা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ এই মর্মে বলেছেন যে যখন মানুষ সম্পূর্ণ নির্জন নির্বান্ধব হয় তখন তার স্বাতন্ত্র্যের বিন্দুমাত্র বিঘ্ন ঘটে না। সেখানে সে কারোর দায়িত্ব যেমন নেয় না, কারর সঙ্গে কোনো রকম সম্বন্ধে সে যেমন জড়ায় না তেমনি তার প্রতিও কারোর কোনো নির্ভরশীলতা থাকে না। কিন্তু এ ধরনের স্বাধীনতা মানুষ শুধু চায় না পেলে খুব দুঃখ পায়। মানুষ যখন পরস্পরের দায়িত্বে নিজেকে জড়ায় তখন তার সে স্বাধীনতায়

ক্ষতিজনিত দুঃখ থাকে না। কারণ তখন তাদের সম্বন্ধের ভেদ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের কাছে মানবিক সামঞ্জস্যের হানি হওয়ার অর্থ স্বাধীনতার হানি। তাই তিনি মনে করেন সম্বন্ধের পরিপূর্ণতায় স্বাধীনতার অর্থ সফল হয়ে ওঠে। তিনি আরও বলেন-

> "যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা, যে আমার পরম বন্ধু, সুতরাং যে আমাকে বাঁধে আমার চিত্ত তারই সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা পায়, কোনো বাধা পায় না। যে-স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায়, সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়। এর কারণ হচ্ছে, অসংবদ্ধ মানুষ সত্য নয়, অন্যের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই সে নিজের সত্যতা উপলব্ধি করে। এই সত্যতা উপলব্ধির বাধায় অর্থাৎ সম্বন্ধের ভেদে, অসম্পূর্ণতায়, বিকৃতিতেই তার স্বাধীনতার বাধা। কেননা, ইতিসূচক স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। মানুষের গার্হস্থ্যের মধ্যে বা রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব বাধে কখন, না, যখন পরস্পরের সহজ সম্বন্ধের বিপর্যয় ঘটে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য লেখনি দ্বারা এটাই বোঝাতে চাইলেন যে চারপাশের হিংসা অসহযোগিতার মূল কারণ হল পরস্পরের মধ্যে যে মিল থাকার কথা ছিল তাতে বিঘ্ন ঘটেছে-

> "এক অংশের বড়ো বেশি গৌরব, আর-এক অংশের বড়ো বেশি লাঘব হয়েছে।"[২]

ফলতঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্ষমতার কাঠামো ও তার রাজনীতিটি। ভিন্নতা, বৈচিত্র্যের যেখানে একসঙ্গে থাকার কথা, সেখানে তাদের মধ্যে বিভেদ শুধু নয় মূল্যায়ন করে অবস্থানগতভাবে বিচ্ছিন্ন করে বৈষম্যকে স্থান দেওয়া হয়েছে। গৌরব ও লাঘব অবস্থান থেকে গঠিত হয় কেন্দ্র ও প্রান্ত। সেই অসাম্যের ভিত্তি হল অ-ক্ষমতায়ন ও বিচ্ছিন্নতা। তিনি তাঁর গানে বলছেন-

> "ছন্দ তোমার ভেঙে গিয়ে দ্বন্দ্ব বাধায় প্রাণে।
> অন্তরে আর বাহিরে তাই তান মেলে না তানে"[৩]

ছন্দের হানি দ্বন্দ্বের মূল কারণ। আসল উপলক্ষ্য হল 'সাম্য-সাধন'। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সবাই সমান, এক জনের কথাই সবার কথা হয়ে উঠুক, তবেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে- এমন প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ আদৌ দেননি। এইস্থলে অবশ্যই থাকবে বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন। যেকোনো বিপ্লব সংঘটিত হয় সম্বন্ধের ভেদ থেকে। তা সে রাষ্ট্র বিপ্লব হোক আর পারিবারিক দ্বন্দ্ব। যেকোনো অশান্তির পরিনতি হল স্বাধীনতার ক্ষতি বা সমন্বয়ের ক্ষতি। সকল প্রকার ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে, সকল লোকের সঙ্গে যথাসম্ভব সত্য ও বাধামুক্ত হয়ে যে যে সম্বন্ধ গড়ে ওঠে তাকেই রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা বুঝেছেন। যে কোনো সমাজের মূলে যদি ভেদবুদ্ধি থাকে তবে তার থেকে অবধারিতভাবে জন্ম নেয় হিংসার। তখন কেবলমাত্র স্বাধীনতা চাই বা তার চর্চা করে যেতে হবে এরকম অভিমত পোষণ করলে শুধু হয় না অর্থাৎ যারা ভেদকে নিজের প্রাথমিক অস্তিত্বের মধ্যে বা নিজের পরিচিতের মধ্যে প্রোথিত করে রেখেছে তাদের কাছে স্বাধীনতার কথা কেবল কথার কথা হয়ে গেছে। তা কেবল রাজনৈতিক বুলি অর্থাৎ আমাদের সত্তায়, যাপনে ভেদকে বজায় রেখে দিয়ে সামঞ্জস্য সাধনের কথা বলা সোনার পাথর বাটির মতো অলীক।

বিশ্বের ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখলে আমরা দেখব যেকোনো বিপ্লবের মূলে রয়েছে কোনো না কোনো ভেদ। ইউরোপের নানা জায়গায় লিঙ্গের ভিত্তিতে, শ্রমের ভিত্তিতে আবার কোথাও রং-এর ভিত্তিতে অধিকার ভেদ হতে দেখা গেছে, আবার কোথাও মুনাফাভোগী ও শ্রমিকের মধ্যে ন্যায্য মজুরিকে কেন্দ্র বৈষম্য ঘোরোতর হয়ে উঠতেও দেখা গেছে। এই ভেদের মোকাবিলা করতে বিপ্লব ও পরিবর্তনও হতে দেখা গেছে, তা বেশ কিছুদিন পরিস্থিতিকে সামলে রাখে আবার গঠিত হয় আরেকটি ভেদের কারণ, তার থেকে জন্ম নেয় অন্যরকমের অস্থিরতা, পুনরায় তাকে সংহত করা হয় অপর আরেকটি বিপ্লব দিয়ে। একই ভাবে চলতে থাকে আমাদের ইতিহাসের পর্ব থেকে পর্বান্তর। রবীন্দ্রনাথের কাছে ভেদের থেকে মুক্তিই হল স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ। তাঁর কাছে অসমন্বিত মনুষ্যত্ব অসত্য এবং এই সত্য উপলব্ধিতে যে

সকল বাধা তৈরি হয় সেগুলি হল স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা হল ইতিবাচক স্বাধীনতাকে প্রাপ্ত হওয়া। এই স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। যুক্ততাই এই স্বাধীনতার চালিকাশক্তি। এতে যে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় তাতে অধীনতা জনিত দুঃখ থাকে না। সেক্ষেত্রে দায়িত্ববোধ বা কর্তব্য পালন এইসবই হয় সেই সংযুক্তির বা পারস্পরিকতার স্বাভাবিক ফসল। তাই তিনি যে সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা চুক্তিভিত্তিক নয় সংহতি ভিত্তিক। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল কেন ভেদ ঘটে? রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এর মূল কারণটি আসে অবিশ্বাস, ভয়, একে অপরেরকে ঠকিয়ে জিততে চাওয়া ইত্যাদি আগ্রাসী আস্ফালনমূলক মনোভাব থেকে। এক কথায় বলা যায় এর মূলে রয়েছে ক্ষমতার অসম বন্টন। একদলের কাছে আছে আর অন্যপক্ষের কাছে একেবারেই নেই। ক্ষমতার স্রোতটি উপর থেকে নিচে বাহিত। উত্তর আধুনিক কালে আবার একে অন্য রকম ভাবে প্রকাশ করা হয়। কোনো এক স্থানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে নেই, ছড়িয়ে আছে জালের মত। কিন্তু সেক্ষত্রেও সমতার ভারসাম্য কোথাও নেই অসমতাই রয়েছে, সেটিই সত্য। এখন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতার ধারণাকে পুনর্নির্মাণ করে সাম্যসাধনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায়নকে স্থাপন করার জন্যই রবীন্দ্রনাথকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ক্ষমতার আস্ফালনের প্রথম অভিঘাত ঘটে মানুষের পারিবারিক নানান সম্পর্কে মধ্য দিয়ে। পরিবারে ছোট-বড়, স্বামী-স্ত্রী, সেবক-সেবিত সমস্ত সম্পর্কের মধ্যেই প্রোথিত থাকে ক্ষমতার অসম বন্টন। এক পক্ষের অসীম ক্ষমতা রয়েছে আর অন্য পক্ষে রয়েছে তার প্রতি বশ্যতা। তিনি তাঁর 'পারিবারিক দাসত্ব' নামক একটি প্রবন্ধে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন মনুষ্য জাতি স্বভাবতই ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। তাই একজনের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকাটা অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। সেখানে তিনি বলেছেন-

> "আমাদের পরিবারের মূলগত ভাবটা কী? না, শাসনকারী ও শাসিতের সম্পর্ক, প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক, গুরু ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। আর কোনো সম্পর্ক নাই... কিন্তু এ কথা আমরা কবে বুঝিব যে, যত দিনে না আমাদের হৃদয়ের অস্থিমজ্জাগত দাসত্বের ভাব দূর হইবে, ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার ভাব হৃদয়ের শোণিতস্বরূপে হৃদয়ে বহমান হইবে ততদিন আমরা দাসই থাকিব। আমরা যে প্রতি পরিবারে এক-একটি করিয়া দাসের দল সৃষ্টি করিতেছি! ...প্রাণের মধ্যে অধীনতার আসন ও রসনার উপরে স্বাধীনতার আসন। অমন একটা নর্তনশীল আসনের উপরে স্বাধীনতাকে বসাইয়া আমরা দিবানিশি ওই শব্দটার নৃত্যই দেখিতেছি। বড়ো আমোদেই আছি!'[৫]

ক্ষমতার অসম বন্টন দাস বা অধীনতা রূপ মানসিকতার জনক। আমাদের ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক দাসত্বের হাল টানতে টানতে আমাদের স্ব-চেষ্টাগুলিকে আমরা হারিয়ে ফেলি। বর্তমানে আমরা আমাদের দায়িত্ব না নিতে নিতে, নিজ দায়িত্বকে অন্যের কাছে সমর্পণ করে দিয়ে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার অন্যের উপর ছেড়ে দিয়ে মুখে কেবল স্বাধীনতাহীনতার জন্য আফসোস করছি। নিজের জীবনকে নিজের মতো করে চালনা করার অধিকার সবটাই চলে গেছে ক্ষমতাবান লোকের হাতে। সমাজ, ধর্ম, পরিবারের বিভীষিকায় ছোটবেলা থেকেই ব্যক্তি দাস- তারা আপন মতে চলতেও পারে না আর সেই কারণেই তারা 'বিফলতার বিষম আবর্তে' ঘুরপাক খায়। এই অধীনতা হল একপ্রকার মানসিক অবস্থা, যা মানুষ বাল্যকাল থেকে শিক্ষা করে। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত যখন ব্যক্তি বড় হয় তখন সমাজ যে ভূমিকা সে পালন করবে তা বোধ করি দাস ভিন্ন অন্য কোনো ভূমিকা হবে না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ সত্তার বিকাশ এর গোড়ার কথা তুলেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তি যে ঐতিহাসিকতার মধ্যে জন্মায় সেখানে তার নিজেকে নতুন কোনো অর্থ প্রদান করার সাহস ও আত্মবিশ্বাস, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ব নেওয়ার মতো মানসিকতা গড়ে উঠবার কোনো পরিবেশ থাকে না। ফলে সে অধীনতার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের কর্তৃশক্তি অন্যকে দান করে দেয়। ক্ষমতার অসম বিন্যাসে পর্যদুস্ত সমাযে ব্যক্তির আর কোনো প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা থাকে না। একেই রবীন্দ্রনাথ অবুদ্ধি বলেছেন। এই অবুদ্ধি আমাদের বিনা বাক্যব্যায়ে সবকিছুকে মেনে নিতে শিখিয়েছে। যা ঘটে চলেছে তাকে চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে বলেছে। গোটা সমাজ ব্যবস্থা ও জাতিকে পৌনপুনিকতার মাধ্যমে কাজ করিয়ে যান্ত্রিকতায় পারদর্শী করে তুলেছে। মানবী অস্তিত্বের অর্থকে অনর্থে পরিণত করে দিচ্ছে, এটাই অবুদ্ধি। রবীন্দ্রনাথ অবিলম্বে এর নাশ চেয়েছেন। একেই হয়ত সাঁর্ত 'bad

faith' বলেছেন। শুধু তাই নয়, অবুদ্ধি থেকে জন্ম নেয় অকল্যাণ এবং অশুভের বোধ। আত্মহারা মানুষ নিজেকে কর্তৃশক্তিহীন এবং আত্মশক্তিরহিত এক সত্তারূপে সমাজে স্থাপন করে চলেছে। এতে শুধু পরাধীনতার জন্ম হয় তা নয়, এর পাশাপাশি চলে বিষয়করণের মহাযজ্ঞ। 'অধীনতা'র ধারণা স্বাভাবিক এক আদর্শ রূপে মনোজগৎ থেকে বস্তুজগৎ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত মানুষ অন্যের উপায় স্বরূপ হয়ে উঠছে। সমাজে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে শাসক-শোষিতের দ্বিকোটিকতা অর্থাৎ অপরতা। তাই জীবনের জটিলতাকে নাগাল পেতে হলে বিশ্লেষণী উপায়ে সমাধানের রাস্তা খুঁজলে হবে না, চাই আমাদের অন্য পদ্ধতি। অধীনতাগ্রস্থ মানসিকতার মূলোৎপাটনে ও স্বাধীন চিন্তা বোধে নিজেকে গড়ে তুলে ক্ষমতায়নের পথে ব্যক্তি ও সমাজের নব সত্তানির্মাণ করা তাগিদেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ সত্তা সকলের মধ্যে এমন এক বিচিত্র সমাহারের প্রস্তাব দিয়েছেন, যা এক ভিন্ন নির্মাণের পথকে প্রশস্ত করে। এর তাগিদে রবীন্দ্রনাথ ফিরে তাকিয়েছেন আমাদের তপোবনের দিনগুলির দিকে। আধুনিক 'সভ্যতালক্ষ্মীর' আবাস স্থল এখন ইটের বৃহৎ ইমারতের উপরে। ভারতবর্ষের ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন। সভ্যতা স্থাপিত হয়েছিল বন-গাছপালা- নদী- সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাকে ঘিরে। সে সভ্যতায় মানুষ ছিল, ফাঁকা জায়গাও ছিল, কোনো ঠেলাঠেলি ছিল না । সেই সময় মানুষের চেতনা আরও উজ্জ্বল ছিল, মানুষ বেশি জাগ্রত ছিল। অরণ্যের নির্জনতায়, বৈভবহীনতায় বুদ্ধি অভিভূত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> "এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগে নি। ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার যাঁরা কান্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।"[৬]

অন্যদিকে সমুদ্রতীরবর্তী সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটেছে বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে, মরুবাসীরা অল্প ক্ষুন্নিবৃত্তিতে জীবন যুদ্ধ জয় করেছেন- এইভাবে মানুষের শক্তি নানা পথ ধরে এগিয়েছে। মানুষকে তার শক্তির উপলব্ধি করেছে কোনো না কোনো বাহ্যিক তাড়ণা বা বাহ্যিক পরিস্থিতির তাগিদে। কিন্তু ভারতে তরুলতা-পশু-পাখির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদকে দূর করে দিয়েছে তপোবন। এইখানে চেতন-অচেতনের সকলের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষকে আর্বত করে যে জগৎ তার সঙ্গে প্রকৃতির বিরোধ বাঁধলে অথবা একান্ত মানবসভ্যতাময় সভ্যতার মধ্যে যদি প্রকৃতির স্থান বিন্দুমাত্র না থাকে তাহলে মানুষের অস্তিত্বের সংকট ঘনীভূত হবেই এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্থির বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> "We know of an instance in our own history of India when a great personality struck up in his life and voice the key-note of the solemn music of man-love for all creatures. And that music crossed the sea and the mountain and the desert, and races belonging to different climes and habits and languages were drawn together, not in a clash of arms or in the conflict of exploitation but in co-operation of life, in amity and peace."[৭]

এভাবে আমাদের সভ্যতাও হয়ে উঠেছে এক ছন্দময় সৃষ্টি। আর আজ সেই সৃষ্টি বিপন্ন, মানষে মানুষে, মানুষে প্রকৃতিতে সেই সুর আর বাজে না। একের মধ্যে অন্যের সামঞ্জস্যের বিরোধ ঘটেছে। মানবিক বর্তমান সভ্যতায় সৌন্দর্য ও সদাশয়তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে না। তাই দেখা যাচ্ছে সমস্ত সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হল যেকোনো বিচ্ছিন্নতা। এর থেকে যাবতীয় অকল্যাণের সূত্রপাত। তাই আত্মচ্যুত ও জগৎচ্যুত ব্যক্তির সত্তার পুনঃস্থাপন করার জন্যই রবীন্দ্রনাথকে ফিরে পেতে চাওয়া। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঐতিহাসিক মানুষের মিলনে বেসুরের সমাহার ঘটেছে। সভ্যতার ইতিহাসে, মানুষ তার সকল সুকুমারবৃত্তিগুলির দ্বারা মিলিত না হয়ে সম্পর্ক স্থাপন করেছে চুক্তির মাধ্যমে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আড়ালে উৎপাদনশীলতা ও বাজার অর্থনীতি সৃজনশীলতাকে নিষ্ফল করে দিয়ে মানবতাকে সং-এ পরিণত করেছে।

এতে সুরমূর্ছনায় ছেদ ঘটছে। বাইরের কোনো কাঠামোকে অবলম্বন করে এই বিচ্ছেদকে অপসারিত করতে চাইছে বিজ্ঞান ও বাজার। বিশ্বায়নের যুগে যে এক বিশ্ব গড়ে উঠেছে কেবলমাত্র চাহিদা, উপযোগিতাকে আশ্রয় করে। এইরূপ সভ্যতার নির্মার্তা যাই রচনা করে তাই হয়ে ওঠে পুরাতনের ছাপ বা ইমপ্রেশনস মাত্র। রবীন্দ্রনাথ একে 'aping of creation' বলেছেন। মানুষের জীবন খর্বিত হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকতার দ্বারা। ছকে ফেলার এই কৌশলে মানুষের আত্মশক্তি ও আত্ম-সৃজনের কোনো প্রশস্ত ক্ষেত্র অবশিষ্ট নেই। মানুষকে সৃজনশীলতার নামে কতগুলি উপায় শিখিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রতি, এই কাঠামোর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে কেবল শেখানো হচ্ছে। মানুষ এতে খুব তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হতে পারছে কারণ অধীনতা তার মজ্জায় মজ্জায় নিহিত হয়ে আছে। এতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে ঠিকই, তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে অস্থিরতা। ফুকো একেই আধুনিক ক্ষমতা তন্ত্র বলেছেন। তাঁর মতে ক্ষমতার আস্ফালনের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে প্রতিবর্তন বা পালটা মারের সম্ভাবনা। বিপ্লব ও প্রতি বিপ্লবের মধ্যে তিনি মুক্তির পথকে দেখেছিলেন। তিনি খুব জুতসই ভাষায় বলেছেন ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ নেই। ক্ষমতার যাবতীয় শাখাপ্রশাখা 'কল-কব্জা' চতুর্দিকে পরিব্যপ্ত- তা কেবল বাহ্যিকভাবে উপর থেকে নীচে নয় আগাপাশতলা, সূক্ষ্ম থেকে অতিসূক্ষ্মে, প্রাত্যহিকতার নানা ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। তবে এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষমতা অসম বন্টনের যে কাঠামো তা বহাল থেকেই যায়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই কাঠামোটির মেরামত করার ইঙ্গিত দেন না। তাঁর কাছে প্রাতিষ্ঠানিকতা আর প্রতিবাদের বাইরে যাওয়ার এক অনন্য পথ জানা আছে। যা আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে প্রোথিত। তাকে আবার করে খুঁজে বার করতে হবে। তবে তিনি আচার-সর্বস্ব অতীতেকে আঁকরে ধরার কথা কোনো মর্মেই বলেননি। রবীন্দ্রনাথ যুগের অগ্রগতিকে স্থাপন করতে চাইছেন সামঞ্জস্য ও মানবতার মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান হল সভ্যতার ধারক, আর এই বিজ্ঞান হাত মিলিয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে। অর্থাৎ বাণিজ্যের জন্য বিজ্ঞান তার গবেষণগারকে প্রস্তুত করছে। নিযুক্ত হয়েছে মানবতাবিরোধী আবিষ্কারে। মানুষ এভাবেই বাজারের দাসত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে।

দুই

সমগ্র বিশ্ব সংসারের দুটি গতিবেগ আছে এক অভিকেন্দ্রিক (centripetal) ও অন্যটি অপকেন্দ্রিক (centrifugal) ঠিক তেমনি মানুষেরও দুটি অভিমুখ রয়েছে- একটি তার কেন্দ্রাভিমুখী বা অন্তরমুখী অন্যটি বহির্মুখী। এখন মানুষ অপকেন্দ্রিক বেগে ধাবিত হয়ে চলেছে বাইরের দিকে। বাহ্য জগৎ-কে কিভাবে দমন করা যায়, তাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আধিপত্য বিস্তার করা যায় এটাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ভিতরে আর যা-ই থাকুক আনন্দ থাকে না। বস্তুত অপকেন্দ্রিকতা হল বিচ্ছিন্নতার অপর নাম-তা অন্তর থেকে বিভেদ সৃষ্টি করে, স্বাতন্ত্র্যের নামে সে মূল থেকে ছিন্ন করে। আর সেটি সম্পন্ন হয় ভোগের মাধ্যমে। ভোগের কাছে মানুষ তার বশ্যতা স্বীকার নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল তার সভ্যতা। বর্তমানে এই শক্তিটি বিপর্যস্ত, বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে তার স্বরূপ অবস্থান থেকে। তিনি বলেছেন –

> "This diversion of man's energy to the outside is producing an enormous quantity of materials which may give rise in us to the pride of power but not the joy of life. The hugeness of things is everyday overawing the greatness of man, and the gap between matter and life is growing wider."[৮]

প্রযুক্তির দ্বারা যন্ত্র মানুষকে চালিত করছে, তাতে মানুষ অপরের ছোঁয়াকে বিস্মৃত হতে শুরু করেছে। এখন মানুষ শিল্পের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতাকে জাহির করে, এতে প্রতিষ্ঠা পায় তার ক্ষমতার দাম্ভিকতা। রবীন্দ্রনাথ বলেন স্রষ্টার হলেন নম্র অথচ প্রত্যয়ী আর নির্মাতার থাকে ক্ষমতার আস্ফালন। যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির দিকে তাকাই তবে দেখ প্রায় সব নাটকেই এমন একটি চরিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন যে বা যাঁরা হলেন সেই অর্থে সৃষ্টির হোতা তাঁরা আমাদের বিকল্পের কথা বলেন। যেমন- রক্তকরবীর বিশু পাগল, নন্দিনী, অচলায়তনের দাদা ঠাকুর বা সাগরপারের রাজপুত্র। বিশু পাগল বন্দি দশাতেও গান গেয়েছিল, রক্তকরবীর রাজাকেও রাজ ধ্বজা ভেঙে যোগ দিতে

হয়েছিল সবার সঙ্গে, তাসের দেশের রাজাও স্বেচ্ছানির্বাসনে যেতে চেয়েছিলেন– এসবই বিকল্পের সন্ধানে, যা ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাকে সরিয়ে সংযুক্তির মাধমে স্বাভিমান ও ক্ষমতায়নকে প্রতিষ্ঠা করার সাহসের কথা বলছে। সেই আত্মপ্রত্যয়ের অনুসন্ধান করতে রবীন্দ্রিক আদলকে আমরা খুঁজতে পেতে চাইছি।

আমরা প্রথম ক্ষমতার আগ্রাসনের অভিঘাত যে কি ভয়ংকর হতে পারে তার টের পেয়েছিলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ক্ষমতার ঘনীভূত মেঘ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে হিংসা লীলায় মত্ত হয়ে উঠেছিল। ক্ষমতা মাত্রই ছিল বোমা ও সন্ত্রাস। এই হুঙ্কার নপুংশকের। কারণ এতে আত্মশক্তি নেই। ব্যক্তিতাহীন আদর্শের দ্বারা তা চালিত। এই বক্তব্য ভারতবর্ষের জন্য সত্য। আমাদের মধ্যে যদি বিভেদ নীতি সঞ্চার না হতো, আমরা যদি ক্ষমতার সমকক্ষতায় অপরকে আলিঙ্গন করতে পারতাম, নিজেকে আত্মবিশ্বাসী বলে ভেবে নিজ অস্মিতা তৈরি করতাম তাহলে হয়তো কোনোদিনই আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাধা পরতাম না। কোনোদিনই ইংরেজ আমাদের মাথায় উঠতে পারতো না। আমরা আমাদের আত্মশক্তিকে ছেড়ে দিয়ে ক্ষমতার লোলুপতার কাছে আত্ম-সমপর্ণ করেছিলাম। আসলে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিতা আর ক্ষমতার নতুন বিন্যাসকে স্থাপিত করতে ও তাকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে ভিন্ন ক্ষমতার বিন্যাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন সেটি হল মানুষে মানুষে সমবায়িক ক্ষমতার সামঞ্জস্য। প্রতিটি মানুষকে একত্রিত করতে গেলে তা যে বাইরের নিয়মের দ্বারা হবে না তাও তিনি অনুভব করেছিলেন। এই সাম্য সাধিত হবে ভিতরের শক্তি থেকে। আর সেই নতুন ক্ষমতার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য তাই চাই নতুন সাধন ও লক্ষ্য। বাহ্যিক কোনো অভিঘাতই মানুষকে আত্ম উপলব্ধি ঘটাতে পারেনা। স্বার্থবুদ্ধির জোড়েও যদি আমরা একত্রিত হই বা বিপন্নতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করি তাকেও রবীন্দ্রনাথ মেনে নেবেন না। কারণ সে সাম্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সাময়িক। এখানে পৃথক থেকেই অপরকে তার স্থান দেওয়া হচ্ছে, এ প্রকৃত সাম্যসাধন নয়। স্থির জলে একটা ছোট ইঁটের টুকরো ফেলা হলে ছোট ছোট অনেক বৃত্ত গড়ে ওঠে এবং তা অবশেষে একটি বড় বৃত্তের আবর্তে মিলিয়ে যায়, একাকার হয়ে একটি বৃহৎ বৃত্ত গঠন হয়। ঠিকই একইভাবে মানুষ তার বৃত্তকে সৃজনশীলতা, প্রেম, সম্পর্কের যুক্ততা দিয়ে এক মিলিত বৃহৎশক্তির স্থল যতদিন না তৈরি করতে পারবে ততদিন মানুষের যেকোনো মুক্তিই হবে নঞর্থক মুক্তি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কাঠামোগত পরিবর্তনের কথাই বলেছেন, তার উপাদানগুলির বিনির্মাণের কথা তুলছেন। তাঁর কাছে সমস্যা হল বৈচিত্র্যময়তাকে কিভাবে একটি ছবিতে ফুটিয়ে তুলবেন আর বিজ্ঞান ও বাজারের উদ্দেশ্য হল বৈচিত্র্যকে কিভাবে ও কত রকম ভাবে একটি ছকের মধ্যে আনবে। বিজ্ঞান কখনোই তার স্থান মানবতার জন্য ছেড়ে দেয়নি। কারণ তার কাঠামোটাই এইরকম। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত বাঁধে মানবিক অনুভূতিগুলির। যে স্বাধীনতা আমাদের ক্রিয়া-কলাপকে, শক্তিকে এবং আমাদের সকল সৃষ্টিকে প্রসারিত করে না, যে কেবল বাহ্যিক কিছু লাভ বা অর্জনের মধ্যে থেকে যায় তাকে আর আমাদের অন্তরের সম্পদ বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষের চূড়ান্ত সত্য তার বুদ্ধিতে নেই, এমনকি তার বস্তুগত মূল্যেও নেই—

> "it is in his imagination of sympathy, in his illumination of heart, in his activities of self-sacrifice, in his capacity for extending love far and wide across all barriers of caste and colour, in his realizing this world not as a storehouse of mechanical power but as a habitation of man's soul with its eternal music of beauty and its inner light of a divine presence."[৯]

এই চূড়ান্ত সত্যকে উপলব্ধিই স্বাধীনতা।

রবীন্দ্রনাথ যখন পশ্চিমে যাত্রা করেছিলেন তখন সেখানে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল ওখানকার স্বাধীনতার ধারণাটির অত্যন্ত দুর্বল ও অকার্যকর। কারণ তাদের কাছে স্বাধীনতা বাহ্যিক। রাজনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে দমন ও জোড়ই অধিক কার্যকরী। রাজা ষড়যন্ত্রের একটি বাতাবরণের মধ্যে থাকেন, রাজসভায় সর্বদা মিথ্যাচারের গুঞ্জন রয়েছে। এমন কিছু তাঁবেদার যারা রাজাকে নিজের উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে, রাজার বিরুদ্ধে সংগঠিত করে নানান পরিকল্পনা। সার্বিকভাবে একটা বিশ্বাসঘাতকতার পরিবেশ বিরাজিত। বর্তমানে ষড়যন্ত্রের

এই ভূমিকা বিস্তৃতরূপ ধারণ করেছে এবং তা সমগ্র দেশকে প্রভাবিত করেছে। কেমন যেন গোটা দেশ ক্ষমতার অরাজক ভীতিপ্রদর্শনের খেলায় ব্যস্ত। তাদের উচ্চতর মানবিক অনুভূতিগুলো অশ্লীল কপটতার দ্বারা আচ্ছন্ন। প্রত্যেকের মনোবৈজ্ঞানিক স্তরে কূটনীতি তার কড়াল থাবা বসিয়েছে। একে রবীন্দ্রনাথ মানবিক অবমাননা বলেছেন। অথচ পশ্চিমের মানুষ নিজেদেরকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করে এবং তারা এও বিশ্বাস করে যে সার্বভৌম ক্ষমতা তাদের হাতেই রয়েছে। জনগণের মধ্যে আপাত স্বাধীনতার একটা মনোবৃত্তি জাগানো রয়েছে। বস্তুতঃ তার চারপাশে প্রকৃত স্বাধীনতাটি যে হ্রাস পেয়েছে সে বোধ তাদের নেই। কেবলমাত্র চিন্তা-কার্যক্রমগুলি সংগঠিত হয় স্বার্থে সিদ্ধির জন্য। প্রকৃতপক্ষে একদল বিশাল ক্ষমতা কুবের হয়ে উঠেছে আর তাকে ঘিরে প্রলোভন ও শোষণের আর্বত তৈরী হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থে মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে বহুলোকের সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভরসা না করে কেবল ভয় পায়। সারা বিশ্বজুড়ে যে অমানবিক অবিশ্বাসী চাতুরী পূর্ণ মানসিকতা গ্রাস করে ফেলেছ তা পূর্বের আর কোনো বর্বরতা কখনো এত উগ্রভাবে প্রকাশ পায়নি। বর্তমান সমাজ ক্ষমতার প্রমত্ততায় আবিষ্ট, সর্বদা ভয়ের অপচ্ছায়ায় নিষ্ঠুর থেকে অধিক নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেছে। এর দরুণ ব্যক্তি নিজেরাই এত আতঙ্কিত থাকে যে তারা অন্যেকে স্বাধীনতা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনৈতিক হয়ে পরে। কেবলমাত্র অংশীদারি রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থানকে বাঁচিয়ে রাখে। এমন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের প্রতি ভালোবাসা ও সুরক্ষার জন্য তারা চিরকাল উদ্বেগ প্রকাশ করে আর না পাওয়ার জন্য বিপ্লব করবে। এই অস্থিরতার মূলের যে গলদ আছে, বিচ্ছিন্নিতাই যে তাদের প্রকৃত শত্রু তারা চিনতে পারছে না বা চিনতে চাইছে না। পশ্চিমের সভ্যতায় অর্থের প্রাচুর্য ও প্রচার সর্বস্বতা সব কাজের পিছনে ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে।

সত্য স্বাধীনতা আন্তরিকভাবে স্বজ্ঞালব্ধ ও আত্মিক বিষয়- এটি কখনোই বাইরে থেকে আসতে পারে না। যখন নিজেকে ও অপরকে ভালোবাসে ব্যক্তি আনন্দিত থাকে, চিত্তের প্রসন্নতায় সাম্যের গান যখন কণ্ঠ থেকে নির্গত হয় তখনই স্বাধীনতা তার প্রকৃত মর্মে প্রতিষ্ঠা পায়। অন্যেকে বর্জন করে নিজের চারপাশে দেওয়াল নির্মাণ করলে অন্যের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয় ও সমাজিক বিধি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অধিকার-কর্তব্য আদায়-প্রদায়ের তন্ত্র গড়ে তুলতে হয়। আত্ম ও পররে ব্যবধান মানুষের সঙঘবদ্ধ শক্তিকে দুর্বল করে দিয়ে শুধুমাত্র যন্ত্র ও অধীনতাপূর্ণ মানসিকতারই জন্ম দেয়। সেই মানসিকতার অনুকরণ করেছে ভারতবর্ষ। আত্মশক্তি বর্জিত এহেন পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের দেশবাসীকে নিজেরদের কাছে প্রশ্ন করতে বলেছেন তারা যে স্বাধীনতা কামনা করে তা কি কোন বাহ্যিক শর্তে? এটা কি কেবল প্রতিস্থাপনীয় পণ্য বিশেষ, যা একজন শাসকের থেকে অপর আরেক শাসকের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে? তারা কি সত্যিই প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থকে অর্জন করতে পেরেছেন? অন্যায় ও অযৌক্তিক বিধি-নিষেধের দ্বারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে দাসত্বযুক্ত আদর্শে তাদেরকে প্রজন্মকে কি এই সমাজের বড় করে তুলতে চাইবেন? তিনি নিজেদেরকে আবারও জিজ্ঞাসা করতে বলছেন আমরা কি এই আদর্শগুলিকেই চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছি না? ভারতবর্ষ অতীতে যখন অমরতার জন্য কণ্ঠ দিয়েছিল তখন তাতে প্রাণশক্তি পরিপূর্ণ ছিল। তাইতো অনুসন্ধানকারীরা ছিল সত্যদ্রষ্টা, নির্ভীক চেতনা মন্ডিত। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন আমাদের প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতের কথা, তিনি ফিরে দেখতে চাইছেন বুদ্ধের অহিংসার বাণীগুলির দিকে। মনের স্বাধীনতা থেকে উৎপন্ন সৃষ্টিই মূল্যবান। এই আদর্শ সারা এশিয়া জুড়ে ব্যপৃত ছিল। কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তিতে ভাঁটা পরা শুরু হল কবে থেকে? ধীরে ধীরে আমরা জঞ্জালের যুগে পরিণত হলাম কিভাবে? যবে থেকে আমরা আমাদের আত্মশক্তিকে হারাতে শুরু করেছি তবে থেকেই এই অবনমন। তা বোধ করি ইংরেজ সাম্রাজ্যের সময়কাল থেকে। আমরা আমাদের জীবনের প্রকৃত অর্থ ও সমৃদ্ধিকে যথেষ্ট উপেক্ষা করেছি এবং তাকে নিষ্পেষিত করেছি অস্বাস্থ্যকর জোর-জুলুম ও পরাধীনতার মধ্যে। আমরা আমাদের সজীব সত্তাকে নিষ্ক্রিয় করতে বাধ্য করেছি। একটি ছকে ফেলা জীবনের ঘূর্ণাবর্তে নিজেদেরকে আকারিত করেছি। জীবনের আদর্শগুলিকে অন্ধকার মোহাচ্ছন্ন ধর্মের গন্ডিতে আবদ্ধ করে সমস্ত সংবেদনশীলতাকে ঢেকে রেখেছি জগদ্দল পর্বতের মত অনমনীয় অতীতের তলায়। আমরা প্রত্যেকেই আচার-বিচারের আনুষ্ঠানিকতাময় অতীতের তলায় শ্বাসরুদ্ধ। এবং জীবন্ত মানবিক চেতনার ডানা থেকে সমস্ত পালকগুলিকে উৎপাটন করেছি। রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন—

> "And for us, - with our centuries of degradation and insult, with the amorphousness of our national unity, with our helplessness before the attack of disasters from

> without and our unreasoning self-obstructions from within, - the punishment has been terrible. Our stupefaction has become so absolute that we do not even realize that this persistent misfortune, dogging our steps for ages, cannot be a mere accident of history, removable only by another accident from outside."[১০]

তিনি মনে করেন আমরা যদি প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস না রাখি, যদি সর্বদা সৃজনশীল মনোভাবকে পোষণ না করি, আমরা যদি মানবীয় ঝুঁকিগুলি না নিয়ে থাকি তাহলে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা কেন, আমরা আমাদের যাবতীয় ক্ষমতাকেই নিঃশোষিত করে দেবো তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভিতর থেকে নিজের প্রতি আস্থাশীল হওয়াটাই জরুরী। আমরা যদি নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত বিরোধ, দলাদলির বজায় রাখি, দেশের ভাই-বোনেদের শৈশব দশায় আবদ্ধ করে রাখি, নিপীড়ন অনাস্থা প্রদর্শিত করি তবে আমরা একটি অন্ধ গলিতে নিজেরাই ঘুরপাক খেয়ে যাব। নিজেরাই সংহত হতে পারিনি তো লড়াইটাই বা সংঘবদ্ধ রূপ ধারণ করবে কি করে? পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবে বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কার মানুষকে অনেক কিছু থেকে মুক্তি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর পাশাপাশি সত্যকেও মুক্তি দিয়ে ছকের শক্তিতে আবদ্ধ করে ফেলেছে গোটা বিশ্বকে—

> "The present civilization of India has the constraining power of the mould. It squeezes living man in the grip of rigid regulations, and its repression of individual freedom makes it only too easy for men to be forced into submission of all kinds and degrees. In both of these traditions' life is offered up to something which is not life; it is a sacrifice, which has no God for its worship, and is therefore utterly in vain. The West; continually producing mechanical power in excess of its spiritual control, an India has produced a system of mechanical control in excess of its vitality."[১১]

রাষ্ট্রের ক্ষমতা, পুঁজির ক্ষমতা, জাতীয়তাবাদের ক্ষমতা সব মিলিত হয়ে ক্ষমতার আবর্তকে আরও মজবুত হয়ে উঠেছে। একদিকে রয়েছে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক মানুষ, যাদের উদ্দেশ্য সীমিত আর অন্যদিকে নৈতিক মানুষ যিনি পূর্ণ। রাষ্ট্রনৈতিক বাণিজ্যিক মানুষ হল খন্ডিত, সীমিত, বিযুক্ত এবং এদের মধ্যে নৈতিকতার কোনো ভিত্তি নেই। তবে একেবারে যে নেই তা নয়। যে নৈতিকতার রয়েছে তা খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধতা। ইউরোপের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় শিল্প বিপ্লবের থেকে পুঁজিবাদের উত্থান। যন্ত্রপাতি আবিষ্কার, কল-কারখানা, নতুন প্রযুক্তির অবদানে বস্তুবাদের, প্রত্যক্ষবাদের রমরমা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আর এই সুবাদে সংস্কৃতি থেকে জ্ঞানতত্ত্ব সর্বত্রই পট পরিবর্তন হতে দেখা গেছে। এই শতকে মানুষ প্রযুক্তি ও শিল্পের হাত ধরে চিনেছে ও স্থাপন করেছে সামাজিক অসাম্যকে। এর ফলে শুধু জ্ঞানতত্ত্ব বা সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে তা নয় নৈতিক ভিত্তি বা নৈতিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য বৈষম্য যেমন- সামাজিক জাতপাতের বৈষম্য, বর্ণগত বৈষম্য ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধনগত বৈষম্য। ক্ষমতার বৈষম্যে নৈতিকতাও নতুন মোড়কে সজ্জিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে উপযোগিতাবাদ বা হিতকামী নৈতিকতা। এর মূল লক্ষ্য নিজেকে স্বাধীনতা প্রদান করা বা বলা ভালো নিজেকে ক্ষমতাবানরূপে প্রতিষ্ঠা করা। মানুষে মানুষে বিযুক্তিকে তারা আণবিক বিকাশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করলো। সমাজের মোট হিতাহতের পরিমাণ স্থির হল সংখ্যায় নিরিখে। যোগ-বিয়োগের মাধ্যমে মানুষ তাদের সাধারণ ইচ্ছেকে, স্বার্থকে প্রকাশ করলো। মানুষের যূথবদ্ধ জীবনকে তাদের ভালো থাকার সূচকে আনায় জীবনের ছন্দের পতন ঘটাল। আসল কথা হল বিচ্ছিন্ন মানুষ তার একান্ত বিষয়িতা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো। এই দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার বিকল্প হিসাবে প্রথমে সংযুক্ত ব্যক্তিমানুষের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ। ক্ষমতায়নের পথে স্বাধীনতাকে পেতে যে সত্তার প্রয়োজন সেই সংযুক্ত ব্যক্তিসত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা। এ সমস্যা এক প্রকার জীবনবোধের সমস্যা, সামাজিক মননের সমস্যা। তাকে মোকাবেলা করতে হবে আধ্যাত্মিক সামাজিকতাকে ভিত্তি করতে হবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে আদলটা খুঁজছি তা কোনোভাবেই আরেকটি নিটোল কাঠামোর স্থাপনের ইঙ্গিত নয়। রবীন্দ্রনাথ কেবল বৈচিত্রের কথা বলেছেন, সমন্বয়ের কথা বলেছেন কিন্তু সেই বৈচিত্র্যকে এক ছাতার তলায় দুমড়েমুচড়ে ঢোকানো হলে

তার স্বরূপের হানি ঘটবে। সুতরাং এই ভাবনায় নানান ওঠা–পড়া, নানান সুযোগ-সুবিধা-অসুবিধা থাকবে, তাকে আবার গুছিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলার তাগিদও থাকবে, সবাই যাতে তাদের নিজের অবস্থানকে প্রকাশ করতে পারে তার ব্যবস্থাও থাকবে, তাতে সময় লাগবে কিন্তু ধৈর্য হারালে চলবে না। মূলকথা হল সংগতি-অসংগতি, স্থিরতা-অস্থিরতা, নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তা, নিকট-দূর সবই মানুষের অন্তঃস্থলে মিলিত হয়েই সত্য রূপে উদ্ভাসিত করতে হবে। এই দ্বান্দ্বিকতাকে সভ্যতায় প্রোথিত করতেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রাসঙ্গিক করে তুলতে উদ্যত হয়েছি।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "সমস্যা", কালান্তর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, আষাঢ় ১৪২২, পৃ. ২২০
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "সমস্যা", কালান্তর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, আষাঢ় ১৪২২, পৃ. ২১৯
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, মাঘ ১৪২৪, পৃ. ৯
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "সমস্যা", কালান্তর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, আষাঢ় ১৪২২, পৃ. ২১৯
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "সমস্যা", কালান্তর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, আষাঢ় ১৪২২, পৃ. ২১৯
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, মাঘ ১৪২৪, পৃ-
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "সমস্যা", কালান্তর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, আষাঢ় ১৪২২, পৃ. ২১৯
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "তপোবন", শান্তিনিকেতন (১ম খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, বৈশাখ -১৪১৭, পৃ. ২৩৭
৯. Rabindranath Tagore, 'Construction Versus Creation', The English Writings of Rabindranath Tagore, Vol-3, Edited by Sisir Kumar Das, Sahitya Akademy, 1996, p. 402
১০. Rabindranath Tagore, 'Construction Versus Creatioon', The English Writings of Rabindranath Tagore, Vol-3, ed. Sisir Kumar Das, Sahitya Akademy, 1996, p. 402
১১. Rabindranath Tagore, 'Construction Versus Creation', The English Writings of Rabindranath Tagore, Vol-3, ed. Sisir Kumar Das, Sahitya Akademy, 1996, p. 409